ডানপিটে

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

BANGLADARSHAN.COM

॥ডানপিটে॥

যে সময়ে আমাদের গল্পের শুরু, কাশীতে তখন উৎকৃষ্ট ল্যচ্ছাদার রাব্‌ড়ি পাঁচ আনা সের বিক্রয় হইত, ল্যাংড়া আম টাকায় এক পণ, মহিষের দুধ টাকায় পাকি বারো সের।

কাশীতে তখন স্কুল-কলেজ বেশী ছিল না, শহরের বসতি আরও ঘিঞ্জি ছিল, তেলের আলো জ্বলিত রাস্তায়, অত্যন্ত অপরিষ্কার ছিল শহরের অবস্থা, গাড়ি-ঘোড়া ছিল কম। বুঢ়ুয়ামঙ্গলের মেলার সময় গঙ্গার ধারে ধনীদের দু'চারখানা নতুন ধরনের ভিক্টোরিয়া কি ফিটন দেখা যাইত। এক্কা ও স্প্রিং-বিহীন টাঙা ছিল প্রধান সম্বল, শহরের বাহিরে উটের গাড়ি চলিত।

গণেশ মহল্লাতে তখন রামজীবন চক্রবর্তীর খুব নাম ও পসার-প্রতিপত্তি। কমিসারিয়েট বিভাগে বড় চাকুরিতে তিনি বেশ দু'পয়সা রোজগার করিয়াছিলেন, তবে হাতে রাখিতে পারিতেন না। সেকালের রীতি অনুযায়ী তাঁর কাশীর বাড়িটা ছিল একটা হোটেলখানা। চাকুরি-প্রয়াসী বা অক্ষম ও নিরাশ্রয় আত্মীয়স্বজন ও স্ব-গ্রামের লোকের ভিড়ে বাড়িতে পা দিবার স্থান থাকিত না।

রামজীবনবাবুর চার ছেলে, বড় তিনটি ভয়ানক ডানপিটে, স্কুলে যাইবার নাম করিয়া পথে মারামারি করিত, ঘুড়ি উড়াইত, স্কুলের সময়টি কাটাইয়া ছুটির সময়ে বাড়ি ফিরিত। ইহাদের উপযুক্ত সঙ্গীও জুটিয়াছিল দশ-বারোজন পাড়ার ছেলে, সকলেই সমান ডানপিটে, সমানই তাদের বিদ্যার্জন-স্পৃহা। স্কুলের সময় দল বাঁধিয়া বাড়ি হইতে বাহির হইয়া হয়তো শহরের বাহিরে পথের ধারের এক বড় পেয়ারা বাগানে ঢুকিয়া ফল ছিঁড়িয়া খাইয়া ফেলিয়া ছড়াইয়া নষ্ট করিয়া বেলা চারটার পরে বাড়ি ফিরিত। কোনোদিন বা সারনাথের পথে কোথাও চড়ুইভাতি করিতে গেল। মাসের মধ্যে পনেরো দিন এইরকম চলিত।

BANGLADARSHAN.COM

গণেশ-মহল্লাতে প্রেমচাঁদ মুখুয্যে নামে নদীয়া জেলার একজন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ কাশীবাস করিতেন। তাঁর এক পিতৃমাতৃহীন ভাইপো তাঁর কাছে থাকিয়া নামে বিদ্যাভাস করিত, কাজে সে ছিল উপরোক্ত ডানপিটে স্কুল-পালানো ছেলের দলের একজন চাঁই সদস্য। ভ্রাতুষ্পুত্রটির নাম সতীশ, রং টক্‌টকে গৌরবর্ণ, একহারা চেহারা, নতুন স্প্রিং-এর মত তার সমস্ত দেহের একটা দৃঢ়তা, বাঁধুনী ও স্থিতিস্থাপকতা ছিল। নতুন নতুন বদ্‌মায়েশি ফন্দী আঁটিবার বুদ্ধিতে ও সাহসে দলের সকলেই তার কাছে হার মানিত।

ফলে এই দলটির লেখাপড়া যাহা হইবার হইল, তারপর যখন শখের থিয়েটারের ধুম কলিকাতা হইতে কাশী গিয়া পৌঁছিল, এদের দল কাশীতে নব আন্দোলনের প্রতিভূ ও প্রাণস্বরূপ হইয়া মহা উৎসাহে নিজেরাই বড় বড় কাগজে সিন্ আঁকিয়া বেলের আঠা দিয়া জুড়িতে লাগিল। নিজেরাই স্টেজ বাঁধিল এবং ঘণ্টা মার্কা সবেদার সাহায্যে রাজা, উজির সাজিয়া নাটকাভিনয় শুরু করিল।

বছর পাঁচেক পরে প্রেমচাঁদ মুখুয্যের লীলাপ্রাপ্তি ঘটিল, গণেশ-মহল্লার রামজীবনবাবুও গভর্নমেণ্ট পেন্‌সনের মায়া কাটাইলেন। তাঁর ছেলেরা পৈতৃক অর্থ ভাগ-বাঁটোয়ারা করিয়া লইয়া ভায়ে ভায়ে পৃথক হইল। সতীশ নিরাশ্রয় ও কপর্দকশূন্য অবস্থায় এখানে-ওখানে ঘুরিতে ঘুরিতে জুটিল গিয়া নেপালে।

নেপালে যে কি করিয়া সে দরবার হাসপাতালে কম্পাউন্ডারী পাইয়া চাকুরিতে ও চিকিৎসা ব্যবসায়ে দু'পয়সা রোজগার করিতে লাগিল,—যে সতীশ ইংরাজি স্কুলের তৃতীয় শ্রেণীর গণ্ডি দু'তিন বৎসরেও ডিঙাইতে পারে নাই, সে কি করিয়া দুরূহ ইংরাজীতে লেখা ডাক্তারী বই আয়ত্ত করিয়াছিল, সামান্য বেতনের কম্পাউণ্ডার হইয়া সে কি ভাবে অবসর সময়ে রোগী দেখিয়া চিকিৎসা ব্যবসায়ে বেশ নাম করিয়া ফেলিয়াছিল—সে সব খবর দিতে পারিব না। কিন্তু প্র্যাক্‌টিসে সে বাস্তবিকই সুনাম অর্জন করিল, বিশেষ করিয়া অস্ত্র-চিকিৎসায়। ভালো ও নিপুণ অস্ত্র-চিকিৎসকের যে যে গুণ থাকা দরকার—সাফ্ হাত, সাফ্ চোখ, সাহস, সতর্কতা, প্রকৃতিস্থতা, অবিচলিত বিচার-বুদ্ধি—এই সব গুণ তার ধীরে ধীরে বাড়িতে লাগিল—সঙ্গে সঙ্গে পসারও।

সতীশ নেপালে আসিয়া স্থানীয় স্কুলের জনৈক শিক্ষকের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিল। শিক্ষকের নাম মৃত্যুঞ্জয়বাবু, বাড়ি নদীয়া জেলার মেহেরপুরে। পাঁচ বৎসর অন্তর বৃদ্ধ পিতাকে দেখিতে একবার করিয়া দেশে যাইতেন। বিবাহের দুই বৎসর পরে বাংলা ১৩০৭ সালে তাঁহাদেরই সঙ্গে সতীশ বাংলাদেশে অনেককাল পরে ফিরিয়া আসিল ও সর্বপ্রথম কলিকাতা শহর দেখিল। পৈতৃক বাসস্থান যে গ্রামে ছিল, সেখানেও একবার গেল। বাংলাদেশে আসিয়া সতীশের মনে হইল যে, মায়ের মুখ সে ভাল মনে করিতে পারে না, ধোঁয়া ধোঁয়া অস্পষ্ট সামান্য একটু মনে পড়ে, যেন মেঘলা দিনের দিবানিদ্রার স্বপ্ন—সে মায়ের স্নেহ সারা দেশটাকে ছড়াইয়া পড়িয়া যেন সাগ্রহে তাহার প্রত্যাবর্তনের প্রতীক্ষায় পথ চাহিয়া বসিয়া আছে। গ্রামে আসিলে গ্রামের তো কেহ তাহাকে চিনিতেই পারে না, কারণ সে গিয়েছিল নিতান্ত ছেলেবেলাতে দশ-বারো বৎসর বয়সে। পৈতৃক ভিটা খুঁজিয়া বাহির করিতে বেগ পাইতে হইল, কারণ এমন দুর্ভেদ্য বন-জঙ্গলে ঢাকিয়া পড়িয়াছে যে বাহির হইতে চিনিয়া লওয়াই কষ্টকর।

BANGLADARSHAN.COM

গ্রামের সকলেই আসিয়া ধরিয়া বসিল যে, তাহাকে দেশে ঘরবাড়ি করিতে হইবে—এখানে বাস করিতে হইবে। ইহার মধ্যে প্রতিবেশীর পুত্রের উপর নিছক নিঃস্বার্থ ভালবাসা ছিল না, তাহা বলাই বাহুল্য। দেশে মোটে ডাক্তার নাই, সতীশের মত একজন নামজাদা ডাক্তার গ্রামে বসিয়া প্র্যাক্‌টিস করিলে গ্রামের লোকের সুবিধা বড় কম নহে—চক্ষুলজ্জার খাতিরে অন্ততঃ গ্রামের লোকের কাছে সো তো আর ভিজিট লইতে পারিবে না?

সেবার সতীশ ভিটার মায়া কাটাইয়া ফিরিয়া গেল বটে, কিন্তু দেশের মায়া তাহাকে পাইয়া বসিয়াছিল—পরের বৎসরই সে পুনরায় শীতকালে ছুটি লইয়া গ্রামে ফিরিয়া পৈতৃক ভিটার বনজঙ্গল কাটাইয়া সেখানে টিনের ঘর তুলিয়া ফেলিল। ছুটি ফুরাইলে আবার কর্মস্থলে ফিরিল সেবারও।

কিন্তু দেশের মায়া একবার পাইয়া বসিলে তাকে কি ছড়ানো সহজ? চন্দ্রগিরি, উদয়গিরির দুর্গম গিরিসঙ্কট পার হইয়াও নদীয়া জেলার ক্ষুদ্র গ্রামের ডাক নেপালে গিয়া পৌঁছিয়াছিল। পর বৎসর সতীশ চাকুরিতে ইস্তফা দিয়া স্ত্রী-পুত্রসহ দেশে আসিয়া বসিল ও গ্রামে প্র্যাক্‌টিস শুরু করিল।

সে আজ বত্রিশ বছর পূর্বের কথা। তখন অলিতে-গলিতে এম্‌-বি পাশ ডাক্তার হয় নাই, আজকালকারের মত পাশ-করা ডাক্তার খুঁজিয়া মেলানো দুর্ঘট ছিল। নিকটবর্তী নরহরিপুরের বাজারে তখন যাদুরাম স্যাক্‌রা ছিল দেশের মধ্যে বড় ডাক্তার।

যাদুরাম বাদে একজন মুসলমান হ্যোমিওপ্যাথ, একজন কবিরাজও ছিল। ইহারা গেল প্রবীণের দলে। তরুণের মধ্যে কানাইলাল রায় কলিকাতা হইতে কিসের একখানা সার্টিফিকেট আনিয়া ডাক্তার সাজিয়া বসিয়াছিল।

সতীশ আসিয়াই প্র্যাক্‌টিস জমাইয়া ফেলিল। সে উপরোক্ত হাতুড়ে দলের অনুকরণে নরহরিপুরের বাজারে ডাক্তারখানা খুলিয়া আধহাত লম্বা হরফে নিজের নামের সাইনবোর্ড ঝুলাইল না বা রোগীর বাড়ি আসিয়া স্থানীয় অন্যান্য ডাক্তারদের নিন্দাবাদ করাও অভ্যাস করিল না। গ্রামের বাড়ির একখানা ঘরে ঔষধ রাখিত, আলাদা ডিস্‌পেন্‌সারিও ছিল না—রোগীরা আসিয়া বসিত সতীশের বাড়ির সামনে বটতলায়—তাহাদের বসিবার স্থানের পর্যন্ত কোনো ব্যবস্থা ছিল না।

BANGLADARSHAN.COM

কিন্তু এসব সত্ত্বেও সতীশের বাড়ির সামনের বটতলায় রোগীর ভিড় দিন দিন বাড়িয়া চলিল। দিনরাতে স্নাহাহারের সময় নাই, সাত-আট ক্রোশ দূরের গ্রাম হইতেও রোগী দেখিবার ডাক আসিতেছে, গরুর গাড়িতে রোগী দেখিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে সতীশ হাঁপাইয়া পড়িল। প্রতিদিন সকালে নিজের বাড়িতে গড়ে তিন-চারটা সার্জিক্যাল কেস লাগিয়াই আছে।

ব্যাপার দেখিয়া যাদুরাম একদিন কানাই ডাক্তারকে ডাকিয়া বলিল, “এত রুগী এ-দেশে ছিল কোথায় এতদিন হে?” গত বিশ বৎসরের মধ্যে যাদু ডাক্তার এত রোগীর ভিড় কখনো দেখে নাই এ-অঞ্চলে।

বেগতিক বুঝিয়া কবিরাজটি একদিন জিনিসপত্র বাঁধিয়া অন্যত্র সরিয়া পড়িল—কানাই দরজির দোকান খুলিবার জন্য সুবিধামত দোকানঘরের সন্ধান করিতে লাগিল। যাদু স্যাক্‌রার অন্য কোনো উপায় ছিল না এ-বয়সে। আগেকার দু’পাঁচটা বাঁধা পুরানো ঘর ও পূর্ব-সঞ্চিত সামান্য কিছু টাকার জোরে কোনো রকমে টিকিয়া রহিল মাত্র!

সতীশের দু’টি ছেলে ও ছোট একটি মেয়ে। মেয়েটির হঠাৎ একদিন ভয়ানক জ্বর হইয়া পড়িল। নিজের বাড়িতে নিজে চিকিৎসা করা যায় না বলিয়া সতীশ যাদুরাম স্যাক্‌রাকে ডাকাইল। যাদুরাম দেখিয়াই বিষণ্ণমুখে বলিল, তাই তো মুখুয্যে ম’শায়, এ তো ভয়ানক রোগ, আপনিও বোঝেন, আমিও বুঝি, এ-রোগ তো এখানে সারবার নয়। এখন অন্য সবাইকে তফাৎ করুন, ছোঁয়াছুঁয়ি না হয়, ডিপ্‌থিরিয়া বড় সাংঘাতিক ব্যাপার কিনা?

যাদুরাম প্রাণপণে ক’দিন দেখিল, কিছুই করা গেল না। তৃতীয় দিনে মেয়েটি মারা পড়িল।

এই ব্যাপারের পর হইতে সতীশের স্ত্রীর সামান্য মস্তিষ্ক-বিকৃতি ঘটিল—আপনমনে বকুনি, ইহাই দাঁড়াইল উপসর্গ। নয়তো অন্য সবদিকে কোন অপ্রকৃতিস্থতার চিহ্নও নাই, সংসারের কাজ-কর্ম, স্বামী-পুত্রের যত্ন—কিছুরই মধ্যে কোন ত্রুটি নাই।

সতীশ বড় দমিয়া গেল। হাতে পয়সার জোর ছিল, কিছুদিন প্র্যাক্‌টিস বন্ধ রাখিরা এখানে-ওখানে ঘুরাইয়া আনিল সকলকে, পূর্ববঙ্গে শ্বশুরবাড়ি গিয়া রহিল কিছুদিন, কলিকাতায় আসিয়া ডাক্তার-কবিরাজ দেখাইল, তখনকার মত উপশম না হইল যে এমন নয়। কিন্তু দেশে আসিয়াই 'যথা পূর্বং তথা পরং।'

বড় ছেলেটির বয়স বারো, সে তিন ক্রোশ দূরবর্তী রামনগরের হাই স্কুলের বোর্ডিং-এ থাকিয়া পড়াশুনা করিতেছিল। ছোট ছেলেটিকেও এবার সতীশ সেখানে রাখিয়া দিল।

এ-সব বাংলা ১৩১২ সালের কথা।

তারপর যেমন অন্য পাঁচজন মানুষের দিন যায়, সতীশের দিনও তেমনি ভাবে যাইতে লাগিল।

রোগী দেখা, টাকা রোজগার, সংসার প্রতিপালন।

ছেলেরা বড় হইল। বড় ছেলেটির নাম বিনয়, সে আই-এস-সি পাশ করিয়া মেডিকেল কলেজে ডাক্তারি পড়িতে লাগিল। সতীশ পুত্রবধূর মুখ দেখিবার জন্য এই সময় তাহার বিবাহও দিল। ছোট ছেলে তখনও স্কুলের ছাত্র, সে তার দাদার চেয়েও মেধাবী এবং সুবুদ্ধি। ইতিমধ্যে নানাস্থান হইতে তাহার বিবাহের সম্বন্ধ যাতায়াত করিতেছিল।

BANGLADARSHAN.COM

এ সব গেল বাহিরের ব্যাপার। সতীশের মনের বড় অদ্ভুত পরিবর্তন হইতে লাগিল ধীরে ধীরে। পনেরো-ষোলো বৎসর ধরিয়া সে এই গ্রামে এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে ডাক্তারী করিতেছে—এই পনেরো-ষোলো বৎসরের জীবনে নিতান্ত একঘেয়ে—রোগী দেখা, খাওয়া, ঘুমানো, ভূষণ দাঁ-এর দোকানে বসিয়া মাঝে মাঝে গল্প-গুজব, সংসারের বাজার-হাট করানোর ব্যবস্থা করা—দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর—একঘেয়ে, এক রকম জীবনধারা, বৈচিত্র্য নাই, পরিবর্তন নাই, নতুনতর অনুভূতির কোনো আসিবার পথ নাই কোনো দিক্ দিয়া। কিন্তু সতীশ এ বিষয়ে খুব সচেতন নয়, জীবনে তেমন আর আনন্দ নাই, এ কথা এক-আধবার তাহার মনে যে না উঠিয়াছে এমন নয়—কিন্তু এ লইয়া ভাবিতে সে বসে নাই কখনো, ভাবিবার সময়ও পায় নাই।

কিন্তু ক্রমে এ কথাটা তাহার মনের মধ্যে উঁকি মারিতে লাগিল। হয়তো নিস্তব্ধ দুপুরে বিলের পাশের পথ দিয়া গরুর গাড়িতে আরামে সে ভিন্ গাঁয়ে রোগী দেখিতে চলিয়াছে। মাঠের ধারে ধারে ঘুঘু পাখীর ডাকে কিংবা বিলের গভীর জলে বাগদী ছেলের ডোঙা চড়িয়া মাছ ধরিবার দৃশ্যে—সে দেখিত সে হঠাৎ অন্যমনস্ক হইয়া কাশীতে যাপিত বাল্যজীবনের কথা ভাবিতেছে—রামরাম সাহু হালুইকরের দোকানে লছমী বলিয়া সেই মেয়েটি

থাকিত—এতকাল পরেও তার সে গলার সুমিষ্ট সুর যেন প্রাণে লাগিয়া আছে...একবার সে, রামজীবনবাবুর বড় ছেলে বাদল, তাঁর ভাগ্নে নরু—জঙ্গমবাড়ির বারোয়ারী আসরে সিদ্ধি খাইয়া কি কাণ্ডটাই করিয়াছিল।...

নেপালে একবার কর্ণেল খড়্গা সম্‌সের জঙ্গ রাণা বাহাদুরের কন্যার বিবাহেতে নিমন্ত্রিত হইয়া গিয়াছিল। গিয়া দেখিল খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা নাই—একটা মোড়কের মধ্যে মসলা ও সুপারি আর একটা মোড়কে পাঁচটা টাকা। সতীশ কর্ণেল বাহাদুরের দেওয়ানকে বলিল—টাকা কিসের? নিমন্ত্রিত হয়ে এসে টাকা নেওয়া আমরা অপমানজনক মনে করি। দেওয়ান বলিল—এখানে এই নিয়ম। না নিলে কর্ণেল চটতে পারেন।

সতীশ রাগ করিয়া বলিল—চটে আমার কি করবেন তিনি? চাকরি নেবেন? নিন—আমি এখুনি ইস্তফা দিতে রাজী আছি, টাকা কখনই নিতে পারবো না।

গোলমাল শুনিয়া রাণা বাহাদুর আসিয়া ব্যাপারটা অন্যভাবে মিটাইয়া দিলেন। চাকুরি যাওয়া তো দূরের কথা, সেই মাসেই সতীশের দশ টাকা বেতন বৃদ্ধি হইয়াছিল।...

গত পনেরো বৎসর ধরিয়া সতীশ তো অনবরত সকলের কাছেই কাশী আর নেপালের গল্প করিয়া আসিতেছে। তাহার সমবয়সী লোকদের কাছে, দেশের বন্ধুদের কাছে, রোগী ও রোগীদের আত্মীয়-স্বজনের কাছে—কিন্তু সে শুধু বাহাদুরি লইবার জন্য, সে কত দেশ বেড়াইয়া কত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছে, কত বড়মানুষী করিয়াছে, কত বড় বড় লোকের সমাজে মিশিয়াছে—তাহা সাড়ম্বরে জাহির করিবার জন্য। এবার কিন্তু এ সব জীবনের স্মৃতি একটা অস্পষ্ট বেদনার মত তাহার মনে আসিয়া উদয় হইতে লাগিল—কি যেন একটা জিনিস চিরকালের জন্য হারাইয়া গিয়াছে, আর কোনো দিন তাহার সাক্ষাৎ মিলিবে না, সতীশের এই এত বড় পসারের বিনিময়েও না, সঞ্চিত অর্থের বিনিময়েও না, কোনো কিছুতেই না।

BANGLADARSHAN.COM

এ গ্রামের জীবনও ক্রমে নিরানন্দ হইয়া উঠিতে লাগিল। সতীশ গ্রামে আসিয়া ও গ্রামে যে কয়টি সুখের সুখী, দুঃখের দুঃখী প্রবীণ আত্মীয়-স্থানীয় লোক পাইয়াছিল, এ পাড়ার অম্বিকা রায়, শ্যামাকান্ত গাঙ্গুলী—ওপাড়ার বৃদ্ধ গোঁসাই মশায়—এঁরা একে একে মারা গেলেন।

আষাঢ় মাসের শেষে যাদুরাম স্যাক্‌রার রোগশয্যা-পার্শ্বে সতীশের ডাক পড়িল।

যাদুরামের বয়স হইয়াছিল প্রায় পঁচাত্তর বৎসরের কাছাকাছি, গত দশ বৎসর অর্থাভাব ও দারিদ্র্যের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া যাদুরামের স্বাস্থ্য একেবারে ভাঙিয়া পড়িয়াছিল। সতীশ বুঝিল এই বয়সে, তার উপর ডবল নিউমোনিয়া রোগ, যাদুরামও বিছানা ছাড়িয়া আর উঠিবে না। যাদুরাম নিজেও সেটা খুব ভাল করিয়াই বুঝিয়াছিল—ক্ষীণ কণ্ঠে বলিল, মুখুয্যে মশায়, ওষুধ আর কি দেবেন, পায়ের ধুলো দিন। একটা কথা বলি, নাতিটার উপায় করতে পারলাম না, দু'দুটো ছেলে মারা গেল—ওইটুকু বংশের মধ্যে শিবরাত্রির সল্‌তে, ওকে আপনার চরণে দিয়ে গেলাম। কম্পাউণ্ডারীতে ভর্তি করে নেবেন আপনার ডাক্তারখানায়—বছর তিনেক দেখেশুনে শিখলে তবুও অন্য চাষা-গাঁয়ে গিয়ে হাতুড়েগিরি করেও দুটো খেতে পারবে।

সতীশের চোখ জলে ভরিয়া আসিল ভগ্নহৃদয় বৃদ্ধ চিকিৎসকের অন্তিম শয্যা-পার্শ্বে বসিয়া। সে আশ্বাস দিল, এ বিষয়ে তাহার দ্বারা যতদূর সাধ্য সে করিতে ত্রুটি করিবে না। যাদুরাম এমন পয়সা রাখিয়া যায় নাই, যাহাতে তাহার শ্রাদ্ধের খরচ হইতে পারে—সতীশ নিজে শ্রাদ্ধ-সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করিল। নাতিকে নিজের ডাক্তারখানায় আনিয়া কাজ শিখাইতে লাগিল, খুচরা কিছু দেনা ছিল বৃদ্ধের, তাহারও একরূপ সাময়িক মীমাংসা করিয়া দিল।

এই সময় সতীশের নিজের সময়েরও পরিবর্তন দেখা দিল। ছোট ছেলের কলেজের খরচ, বড় ছেলের ডাক্তারী পড়ার খরচ—এদিকে কি জানি কেন রোগীর সংখ্যা কমিতেছে। স্থানটা কি হঠাৎ স্বাস্থ্যনিবাস হইয়া উঠিল নাকি? সঞ্চিত অর্থে ক্রমশঃ হাত পড়িতে লাগিল—এবং সাধারণতঃ যাহা ঘটিয়া থাকে, একবার সঞ্চিত অর্থে হাত যখন পড়িল, সে হাতকে আর গুটানো গেল না—বৎসরের পর বৎসর ক্রমশঃ খরচ বাড়িয়াই চলিয়াছে—আয় তেমন নাই, হাতের টাকা নিঃশেষ হইতে এ অবস্থায় কত দিন লাগে?

সতীশ অমানুষিক পরিশ্রম করিতে লাগিল। আর দুটো বছর, বিনয় মানুষ হইলে আর কিসের ভাবনা? এ অঞ্চলে এম্-বি পাশ করা ডাক্তার কটা আছে? কখনো যেসব গ্রামে দশ টাকা ভিজিটের কমে সতীশ যায় নাই—এখন চার টাকা লইয়াও সেখানে যাইতে হইতেছে। নিজে দুধ খাওয়া ছাড়িয়া দিল—বাড়ির চাকরকে জবাব দিল। খরচ কম পড়িবে বলিয়া স্ত্রী ও পুত্রবধূকে কলিকাতায় পাঠাইয়া ছেলেদের বাসা করিয়া দিল—নিজে দেশে হাত পুড়াইয়া রাঁধিয়া খাইয়া এবং সারাদিন টো টো করিয়া গ্রামে গ্রামে রোগী দেখিয়া যাহা পায়, প্রতি সপ্তাহে কলিকাতার বাসাতে বিনয়ের নামে মণিঅর্ডার করে।

BANGLADARSHAN.COM

বিনয় এম্-বি পাশ করিয়া যুদ্ধে গেল।

সতীশের দুঃখ ঘুচিল এতদিনে।

গ্রামের মধ্যেও একটা সাড়া পড়িল না এমন নয়। এ অঞ্চলে এম্-বি পাশ করা ডাক্তার এই প্রথম। তাহার উপর বিনয় আবার গবর্নমেণ্টের চাকরি পাইয়া সুদূর মেসোপটেমিয়ায় গিয়াছে। সেদিন নাকি ছোটখাটো একটি খণ্ডযুদ্ধে আরবদের গুলি বিনয়ের কানের পাশ কাটাইয়া বাহির হইয়া গিয়াছে, পয়সা কি এমনি হয়? বিনয় পত্রে এই ঘটনাটি বাবাকে জানাইয়াছিল। নরহরিপুরের বাজারে ভূষণ দাঁ-এর পুরানো আড্ডাটা আর ছিল না—কারণ পনেরো বৎসর হইল ভূষণ মরিয়া গিয়াছে। তবুও এ দোকানে, ও দোকানে বসিয়া সতীশ গর্বের সঙ্গে পুত্রের চিঠি হইতে যতটুকু সে-দেশের খবর পায়, তারও সাহায্যে যুদ্ধের গল্প করে।

সঙ্গে সঙ্গে বলে—কিন্তু আমাদের নেপালে যখন প্রাইম-মিনিস্টারের বাড়ির সামনের ময়দানে প্যারেড হোত, তাতে আমরা যুদ্ধের কৌশল সবই দেখেচি। মেশিন্‌গান? ও তো আমাদের সময়েই প্রথমে নেপালে এল...আমাদের কাছে ওসব নতুন নয়—

অর্থাৎ নেপাল ও সতীশের যৌবন—ইহারা কাহারও কাছে পরাজয় স্বীকার করিবে না। সব ছিল নেপালে। দু'চারবার মোটা টাকার মণিঅর্ডার পাইয়া সতীশ মহা উৎসাহে বাড়ি নতুন করিয়া তৈরী করিবার জন্য মিস্ত্রি লাগাইল। ছেলে বড় ডাক্তার হইয়া ফিরিয়া আসিতেছে, সাহেবী মেজাজ এখন তার—এ ধরণের বে-মেরামতি পুরানো বাড়িতে থাকিত তাহার কষ্ট হইবে। সতীশ ছেলের উপযুক্ত মত বাড়ির পুনরায় সংস্কার করিতে অনেক ব্যয় করিয়া ফেলিল। এইখানে ডাক্তারখানা হইবে, এইটা ছেলের বসিবার ঘর, এইটি নাতিদের পড়িবার ঘর।

হঠাৎ মেসোপটেমিয়া হইতে বিনয়ের পত্র আসা বন্ধ হইয়া গেল। দু'দশ দিন করিয়া মাসখানেক কোন খবর নাই—সতীশ অত্যন্ত ধৈর্যশীল, সে নিজে অটল থাকিয়া স্ত্রী ও পুত্রবধূকে নানা মিথ্যা স্তোকবাক্যে ভুলাইয়া রাখিবার চেষ্টা করে, ক্রমে গ্রামময় গুজব রটিয়া গেল বিনয় আর নাই, যুদ্ধে মারা পড়িয়াছে।

বিনয়কে গ্রামের সকলেই ভালবাসিত, তাহার সুন্দর চেহারা ও মধুর ব্যবহারের গুণে বিনয়কে কেহ পর ভাবিত না। এ দুঃসংবাদে চোখের জল ফেলিল না, এমন লোক নাই গ্রামে। সতীশের সহ্য করিবার শক্তি দেখিয়া সকলে অবাক্ হইয়া গেল, তাহার মুখে একদিন কেহ কোনো দুর্বল কথা শুনিল না—চোখে জল দেখা তো দূরের কথা।

জ্যৈষ্ঠ মাস। ভীষণ গরম। মুখুয্যে-বাড়ির তেঁতুলতলার সামনে একখানা ভাঙা গরুর গাড়ির উপর বসিয়া পাড়ার নিষ্কর্মা যুবকেরা আড্ডা দিতেছে—এমন সময়ে সাইকেলে মোড়ের মাথায় সাহেবী-পোষাকে কাহাকে আসিতে দেখা গেল। বিনয়!

BANGLADARSHAN.COM

মুখুয্যে-গিন্নী স্নানান্তে শিবপূজা করিতে বসিয়াছিলেন, পূজা ফেলিয়া ছুটিতে ছুটিতে পথের ধারে আসিলেন অর্থাৎ তাঁহার পায়ের বাতের দরুন যতটুকু ছোটা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় ততটুকু বেগে, বিনয়কে বুকের মধ্যে জড়াইয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন, যুবকেরা সকলে বলিল, আচ্ছা ভয় দেখিয়েছিলেন বিনয়দা, বেশ যা হোক—

বিদ্যুৎবেগে গ্রামের সর্বত্র বিনয়ের প্রত্যাবর্তনের সংবাদ প্রচারিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে সতীশ ডাক্তারের বাড়ির উঠানে সব পাড়ার লোক ভাঙিয়া পড়িল। বিভিন্ন পাড়ায় সেদিন সন্ধ্যায় গ্রামের মেয়েরা হরিল্লুট দিল।

বিনয় যুদ্ধ হইতে আসিয়া প্রথম প্রথম গ্রামেই বসিয়াছিল—তারপরে সে মহাকুমায় গিয়া বসিয়াছে। এত পসার এ অঞ্চলে কোনো ডাক্তারের কেহ কখনো দেখে নাই।

সতীশও ডাক্তারী করিতে স্বগ্রামেই কিন্তু ছেলে আসিবার সঙ্গে সঙ্গে তাহার পসার কমিয়া গেল, সবাই বিনয়কে চায়, সতীশকে কেহ বড় একটা ডাকে না। সে সকলকে গর্বের সঙ্গে বলে, তা তো হবেই, বিনয় এসেছেন। অত বড় ডাক্তার, আমরা তো সেকেলে কোয়াক্, ওঁদের কাছে কি আমরা—

পরাজয়েরও সুখ আছে, গর্ব আছে।

সতীশ একদিন হঠাৎ আবিষ্কার করিয়া ফেলিল, সে বৃদ্ধের দলে পড়িয়া গিয়াছে। গণেশ-মহল্লার সে ডানপিটে সতীশ—ঠাসা বন্দুকের এক দ্যাওড়ে অসিঘাটের ওপরের চরে যে তিনটা পাখী মারিয়াছিল মনে আছে, বুঢ়ুয়া-মঙ্গলের সময় আলোকিত বজরার পাশ দিয়ে ডুবসাঁতার দিতে দিতে কাহাদের আলোকোজ্জ্বল বজ্‌রা—

যাক্, সে সব পুরানো কাসুন্দি ঘাঁটিয়া লাভ কি? মোটের উপর সতীশকে সবাই এখন 'বুড়োকর্তা' বলিতে শুরু করিয়াছে, এটা সে লক্ষ্য করিল; বিশেষতঃ বিনয় ফিরিয়া আসিবার পর হইতে।

নাতিরা স্কুলে পড়ে। সতীশের ছোট ছেলে কিন্তু ভাল হইল না। সে কলেজ ছাড়িয়া দিয়া এতদিন বাড়িতেই বসিয়া ছিল—এইবার দাদার ডাক্তারখানায় কম্পাউণ্ডারী আরম্ভ করিল।

জলের স্রোতের মত বৎসর কাটিয়া যাইতেছে। দেখিতে দেখিতে বিনয়ের প্রত্যাবর্তনের পর সাত বৎসর কাটিল।

এই সাত বৎসরে অনেক পরিবর্তন ঘটিয়া গেল সতীশের জগতে! বিনয় কুসঙ্গে পড়িয়া ঘোর মাতাল হইয়া উঠিয়াছে—পয়সা যথেষ্ট রোজগার করে কিন্তু হাতে রাখিতে পারে না। কাহাকেও মানে না। যুদ্ধে গিয়াই সে মদ খাইতে শিখিয়াছিল। আগে বাপকে ভয় করিত, লোকলজ্জার ভয় রাখিত। এখন বয়স বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে বাপকে আর তেমন মানে না।

BANGLADARSHAN.COM

সতীশ স্ব-গ্রামেই থাকিত। প্রথম প্রথম পুত্রবধূরা গ্রামের বাড়িতেই থাকিত। ক্রমে তাহারা চলিয়া গেল বিনয়ের বাসায়। সতীশের স্ত্রীর সেই উন্মাদ রোগ একেবারে কখনো সারে নাই, এই সময় বেশী করিয়া দেখা দিল। সেই জন্যই মাকে বিনয় দেশের বাড়িতে রাখিয়াছিল। তবু এতদিন সর্বদা দেখাশুনা করিত, শুশ্রূষা ও চিকিৎসার ত্রুটি কখনো করে নাই।

ক্রমে ক্রমে কিন্তু মাকেও সে অবহেলা করিতে লাগিল। এক মাসেও একবার মাকে দেখিতে আসে না, অথচ সে মোটর কিনিয়াছে। এই ন'মাইল পথ আসিতে কতক্ষণ লাগে?

শুধু পানদোষ নয়, আনুষঙ্গিক অনেক উপসর্গই জুটিয়াছে বিনয়ের। স্ত্রী-পুত্রকেও যন্ত্রণা দেয়, সংসারের ন্যায্য খরচের টাকা রাত্রে কোথায় গিয়া ব্যয় করিয়া আসে, কেহ জানে না। প্রায়ই সারারাত্রি বাহিরে কাটায়। মাঝে মাঝে দিনমানেও ডাক্তারখানায় বসে না। পসার কমিতে লাগিল, রোগীরা আসিয়া ফিরিয়া যায়। বৃদ্ধ বয়েসে সতীশ ঘোর অর্থসঙ্কটে পড়িল। বিনয় বাপ-মাকে মাঝে মাঝে টাকা যে না দেয় এমন নয়, কিন্তু তাহাতে সতীশের চলে না। ছোট ছেলেটি দাদার অবস্থা দেখিয়া নিজের স্ত্রী পুত্র লইয়া শ্বশুরবাড়ি চলিয়া গেল, সে-ও বাপ-মায়ের কোনো সংবাদ লয় না।

সন্ধ্যাবেলা বসিয়া বসিয়া তামাক খাইতে খাইতে সতীশ অন্যমনস্ক ভাবেই এই সব কথাই ভাবিতেছিল, এমন সময়ে উঠোনে কাহাকে আসিতে দেখা গেল।

–কে?

–আমি পটল, দাদা।

সতীশ খুশি হইয়া একগাল হাসিয়া হুঁকা হাতে উঠিয়া দাঁড়াইল।

–আয় পটল! আয়, আয়–

পটল বিনয়ের বড় ছেলে দিব্যেন্দুর ডাকনাম। গৌরবর্ণ, সুশ্রী, চোদ্দ-পনেরো বছরের হাস্যমুখ বালক। নাতিদের জন্য বৃদ্ধের মন-কেমন করে সর্বদা–কিন্তু তাহারা বড় একটা এদিকে পা দেয় না। অপ্রত্যাশিত ভাবে নাতিকে দেখিয়া সতীশ যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাইল।

–তোর বাবার খবর কিরে, পটল?

দিব্যেন্দু অপরাধীর মত দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল–সেই একই রকম দাদা। বরং আরও বেড়েচে। পরে সে দাগ দেখাইল, মাতাল অবস্থায় বাবা কি একটা শক্ত এ্যালজেব্রার অঙ্ক কষিতে দিয়াছিল, সে পারে নাই বলিয়া ছড়ি দিয়া মারিয়াছে। দু'জনে বসিয়া অনেক কথা হইল। সতীশ বলিল–বোস্ পটল, রাঁধি গে গিয়ে, খাবি কি নৈলে?

সতীশের স্ত্রী এখন সম্পূর্ণ পাগল, একটা ঘরে একা দিনরাত শুইয়া থাকে, আপনমনে বিড়্ বিড়্ করিয়া বকে, কাজকর্ম করা দূরের কথা, না খাওয়াইয়া দিলে খায় না। সতীশ বলিল–এক একবার মনে হয় পটল, আবার প্র্যাকটিস শুরু করি। কিন্তু এখন আর কেউ আমায় ডাক্‌বে না। ত্রিশ বছর আগে যখন এসেছিলাম এ দেশে, তখন তেমন ডাক্তার ছিল না। এখন নরহরিপুরের বাজারেই তিনটে ক্যাম্বেল পাশ, একটা এম্-বি। ওদিকে তো বিনয় রয়েচে, শ্যামবাবু–সবাই এম্-বি। আমাকে আর কে ডাকবে?

BANGLADARSHAN.COM

দিব্যেন্দু বলে–ভেবো না দাদা। আমি পাশ করে যখন চাকরি করবো, তখন তোমার আর এ দশা থাকবে না।

সতীশ উৎসাহের সহিত বলে–আমায় কাশী পাঠিয়ে দিস, পটল। কতকাল দেখি নি–এই শুন্‌বি তবে আমরা কি করতাম সেখানে?

দিব্যেন্দু জ্ঞান হইয়া পর্যন্ত কাশীর গল্প, নেপালের গল্প অনেক শুনিয়াছে ঠাকুরদাদার মুখে। একই গল্প পঞ্চাশবার সে শুনিয়াছে অন্ততঃ। মুখস্থ বলিতে পারে। তবুও বৃদ্ধ ঠাকুরদাদাকে খুশি করিবার জন্য বলিল–বল না, দাদা! চন্দ্রগিরি পার হবার সময় সেবার নেপালের পথে সেই কি হয়েছিল?

দিব্যেন্দু কখনো নেপাল দেখে নাই, কিন্তু ঠাকুরদাদার মুখে আজন্ম বর্ণনা শুনিয়া চন্দ্রগিরি, রত্নগিরি, রক্‌সৌলের পশুপতিনাথ-মেলার দৃশ্য–এসব তাহার মানসপটে সুস্পষ্ট রেখা ও বর্ণে রূপ গ্রহণ করিয়াছিল। চোখ বুজিলেই এ সব যেন সে দেখিতে পায়।

সকালে উঠিয়া দিব্যেন্দু চলিয়া গেল।

সতীশ বলিল—তোর বাবাকে বলিস্ দিকি পটল, জুতো এই দ্যাখ, একেবারে নেই—স্যাণ্ডেলটা সেই তোর বাবার দরুণ সেবার বাসা থেকে এনেছিলাম, তা ছিঁড়ে গিয়েছে।

দিব্যেন্দু যাবার সময় বলিয়া গেল—এ-সব কথা আমি বলেচি, বোলো না যেন বাবাকে, দাদা। তা হোলে বাবা পিঠের ছাল তুলবে আমার—

দিব্যেন্দু চলিয়া গেলে বৃদ্ধ আবার পুরাতন দিনগুলির স্বপ্ন দেখিতে থাকে। আজকাল হাতে কাজকর্ম একেবারেই নাই—এ ধরণের অলস জীবন সে যাপন করে নাই কখনো—আপনমনে বসিলেই সেই সব কথা মনে আসে।

গাঙ্গুলী-বাড়ির আন্নাকালী দুটি কচি শসা হাতে পৈঠাতে উঠিয়া বসিল—গাছে হয়েছিল জ্যাঠাবাবু, মা বললে দিয়ে আয়।

আঁচলের মুড়োয় বাঁধা কি একটা জিনিস খুলিতে খুলিতে বলিল—আর এই ক'টা—

সতীশের মনের নিরানন্দ ভাব অন্তর্হিত হইয়া গেল। আগ্রহ-উজ্জ্বল চোখে আন্নাকালীর আঁচলে বাঁধা দ্রব্যের দিকে চাহিয়া বলিল—কি রে ওতে? মটরডালের বড়ি! বাঃ বাঃ—দে, রাখ্ এখানে মা।

সতীশ চিরকাল খাইতে ও খাওয়াইতে ভালবাসে। আজকাল অভাবে পড়িয়া গিয়াছে, অমন উপার্জনক্ষম ছেলে থাকিতেও নাই—তাই গ্রামের মেয়েরা ভাল জিনিসটা বাড়িতে হইলে সতীশকে মাঝে মাঝে পাঠাইয়া দেয়।

BANGLADARSHAN.COM

আন্নাকালী চোদ্দ-পনেরো বছরের সুন্দরী মেয়ে—উপরি উপরি চারটি কন্যার জন্মগ্রহণের পরে বাপ-মা পঞ্চম ও সর্বকনিষ্ঠ কন্যাটির ওই নাম রাখিয়াছিল, নামের সঙ্গে তার চেহারার কোনো সম্পর্ক নাই। সে হাসিয়া বলিল—আপনার হাতের সেই কলায়ের ডাল রান্না কখনো ভুল্‌বো না জ্যাঠাবাবু। মেয়েমানুষ অমন রাঁধতে পারে না।

সতীশ খুশী হইয়া উজ্জ্বল মুখে বলিল—কবে খেলি রে, আন্না?

আন্নাকালী ঘাড় দুলাইয়া বলিল—বা রে, এই তো ভাদ্রমাসে অরন্ধনের দিন? তারপর ঘরের দিকে চাহিয়া বলিল—জ্যাঠাইমা কেমন?

—ওই এক রকম, ওর আবার ভালো আর মন্দ! ওরই জন্যে তো কোথাও যেতে পারি নে আন্না। নইলে কাশীতে গেলে একটা পেট চলে যায়। আর কাশীময় আমার বন্ধুবান্ধব, তা ওর অযত্ন হবে, ওকে দেখ্‌বে শুন্‌বে কে, সেই জন্যই তো আছি আট্‌কে। নইলে আমার আবার ভাবনা? এই শুনবি, কাশীতে আমরা কি করতাম?

তারপর কাশীর গল্প আরম্ভ হয়। আন্নাও এসব গল্প ইতিপূর্বে শুনিয়াছে, কিন্তু গল্প শুনিতে সে ভালবাসে, বিশেষ করিয়া জ্যাঠামহাশয়ের মুখে। সে রোয়াকের পৈঠার উপর বসিয়া পড়ে। কাশীর কথা হইতে কখন নেপালের কথা আসিয়া পড়িয়াছে দু'জনের কেহই লক্ষ্য করে নাই, হঠাৎ আন্না উঠানের দিকে ভীত চোখে চাহিয়া বলিল—জ্যাঠাইমা কোথায় বেরিয়ে যাচ্ছে যে!...

–ধর্, ধর্, মা ধর্–নিয়ে আয়! নাঃ, জ্বালালে বাপু।

আন্না দৌড়িয়া উঠিয়া গিয়া শীর্ণদেহ, রুক্ষকেশ, বকুনি-রত জ্যাঠাইমার হাতখানা খপ্ করিয়া ধরিয়া ফেলিয়া বলিল–এসো জ্যাঠাইমা, কোথায় যাচ্ছ, এসো...

–একেবারে ঘরের মধ্যে নিয়ে যা, মা। নাঃ, আমার হয়েচে যতো বিপদ; তা ইয়ে আন্না, কলায়ের ডাল রাঁধবো এখন মা, আজ দুপুরে আমার এখানে দুটো খাস্ এখন।

পরের বছর হইতে বিনয়ের পসার একেবারেই কমিয়া গেল। দশ-বারো বছর আগের ব্যাপার আর ছিল না, এখন এক মহকুমা-টাউনের উপর তিনজন এম্-বি। পানদোষ ও উচ্ছৃঙ্খলতার জন্য ভদ্র-গৃহস্থের বাড়িতে তাহাকে কেহ আজকাল ডাকে না, তা ছাড়া রোগীরা আসিয়াও ডাক্তারের দেখা পায় না।

তাহার পর দেখা দিল পৃথিবী-ব্যাপী মন্দা। পাটের বাজার একেবারে পড়িয়া গেল। রোগ হইলেও আর লোকে ডাক্তার দেখাইতে পারে না। বিনয় মহা অর্থ-কষ্টের মধ্যে পড়িল। সে লোক খারাপ নয়, হাতে পয়সা থাকিলে যতক্ষণ খরচ করিতে না পরে, ততক্ষণ তাহার মনে শান্তি হয় না, উদার দিলদরিয়া মেজাজের মানুষ। বাবাকে সে ইচ্ছা করিয়া যে অবহেলা করে তা নয়, বাবা এত ঘনিষ্ঠ, এত সুপরিচিত যে তাহার সম্বন্ধে সে কোনো খেয়ালই করে না। সতীশ মুখ ফুটিয়া কখনো ছেলেকে জানায়ও নাই তাহার অসচ্ছলতার কথা, পাছে ছেলেকে বিব্রত হইতে হয়।

BANGLADARSHAN.COM

এই অবস্থায় একদিন বিনয় পিতার সহিত দেখা করিতে আসিল। সতীশ অপ্রত্যাশিত ভাবে ছেলেকে দেখিয়া মহাব্যস্ত হইয়া উঠিল। সারা বাড়ির মধ্যে একখানা চেয়ার কি টুল পর্যন্ত নাই, ছেলেকে বসিতে দেয় কিসে যে।

বিনয় বলিল–থাক্ বাবা, থাক্, আমি এই যে বেশ বসেছি।

সতীশ ব্যস্তসুরে বলিল...উঃ, ঘেমে একেবারে...দাঁড়াও একটু চা করে আনি। ভাড়াটে মোটরে এলে কেন? তোমার গাড়ি কোথায়?

–গাড়ি আছে, ইঞ্জিন খারাপ হয়ে গেছে, মেরামতের জন্য একমুঠো টাকা দরকার, হাতে পয়সা কোথায়? কাজেই গাড়ি গ্যারেজে পড়ে।

–পটল কোথায়?

–কলকাতাতেই আছে। ওর পড়াশুনার যে কি করি? মেসে তো একগাদা টাকা খরচ, তিনমাসের মেসের দেনা বাকী। কলেজের মাইনেও দু'মাস পাঠাতে পারি নি।

পিতা-পুত্রে অনেকক্ষণ পরামর্শ হইল। তিন জায়গায় খরচ বিনয় তো আর পারে না। দেশের বাড়ি, টাউনের বাসা এবং দিব্যেন্দুর মেস ও কলেজের খরচ। কি এখন করা যায়?

বিশেষ কিছুরই মীমাংসা হইল না। উঠিবার সময় বিনয় কুণ্ঠিত ভাবে বাবাকে দুটি টাকা দিতে গেল। ছেলের শুষ্ক ও চিন্তাকুল মুখ দেখিয়া বৃদ্ধ টাকা দু'টি প্রাণ ধরিয়া লইতে পারিল না। বলিল—রেখে দাও এখন, সোমবার দস্তিঘাটা থেকে ডাক এসেছিল। কিছু পেয়েচি, তোমার মোটরের ভাড়াও তো লাগবে আবার?

গ্রামের একটি ছেলে রেলে কাজ করিত, ছুটি লইয়া দেশে আসিয়া প্রায়ই সন্ধ্যাবেলা সতীশের কাছে গল্প করিতে আসিত। একদিন সতীশ বলিল—দ্যাখো উমাপদ, ভাবচি কি জানো? তোমার জ্যাঠাইমাকে ওর বাপের বাড়িতে রেখে আমি কাশী চলে যাই। একজন লোকের কাশীতে বেশ চলবে। নইলে এদিকে সবই তো শুনলে—বিনয় বড় মুশকিলে পড়েচে, রুগী-পত্তর নেই, ডাক নেই, এই বাজারে দুটো সংসার চালানো কি সোজা কথা রে, বাবা? আমরা চলে গেলে, ও তবু খানিকটা খোলসা হয়...তাছাড়া কাশীতে আমার বন্ধু-বান্ধব ভর্তি, আহা কত কাণ্ডই করেচি সব এক সময়, কাশীতে কাকে না চিনি?

উমাপদ আবাল্য এসব গল্পের সঙ্গে পরিচিত, সে বলিল—পাগল হয়েচেন? আপনার ছেলেবেলার আমলের তারা কি আর কেউ এখন আছেন ভাবছেন? সে সব কি...

সতীশ কথাটা পছন্দ করিল না, বাধা দিয়া বলিল—তুমি কি ক'রে জানলে নেই? আমাদের সে ডানপিটে দলের ছেলে হঠাৎ মরবার নয় জেনো ('ছেলে' কথাটা অসতর্ক মুহূর্তে মুখ দিয়া বাহির হইয়া গেল)—সব আছে, হেঁ-হেঁ আমরা মরচি নে। তুমি জানো না, আমাদের সে দলের কথা—শুনবে তবে?

BANGLADARSHAN.COM

উমাপদ ব্যস্ত হইয়া বলিল—ইয়ে, জ্যাঠামশায় আর একদিন বরং এসে—আজ একটু কাজ আছে—উঠি এখন।

দিন পনেরো পরে সতীশ একদিন কাশী স্টেশনে দুপুরবেলা নামিল। স্ত্রীকে মেহেরপুরে ছোট শালার কাছে রাখিয়া আসিয়াছে। আসিবার সময় বাড়ির চাবিটা আন্নাকালীর হাতে দিয়া আসিয়াছে, বিনয় আসিলে দিবার জন্য। ছেলেকে কোন খবর দেয় নাই—কেন মিছিমিছি তাহাকে বিব্রত করা।

কাশীতে নামিয়া মনে একটা অপূর্ব উৎসাহ ও উত্তেজনা অনুভব করিল—বাল্যের সেই কাশী! এতদিন কি করিয়া ভুলিয়া ছিল সে! বাংলা দেশের একটা জঙ্গলে-ভরা ছোট্ট পাড়াগাঁয়ে জীবনের ত্রিশটি বছর—

সারাদিন ধরিয়া সে কাশীর পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইল। পঞ্চগঙ্গা ঘাটে স্নান করিল, বিশ্বনাথ দর্শন করিল। বাল্যের দিনগুলির সঙ্গে জড়িত যে সব জায়গায় একদিনের মধ্যে পায়ে হাঁটিয়া যাওয়া সম্ভব, তাহা সে বড় বাদ দিল না।

কিন্তু ধীরে ধীরে তাহার মনে হইতে লাগিল—কাশী, তাহার সে চল্লিশ বছর আগেকার কাশীকে সে যেন খুঁজিয়া পাইতেছে না, সে কাশী কোথায় গেল? এ কাশীকে তো চেনে না।

গণেশ-মহল্লায় পুরাতন সঙ্গীদের সন্ধান কেহ জানে না, কেবল রামজীবনবাবুর মেজছেলে পতিতপাবন পৈতৃক বাটীতে এখনও বাস করিতেছে। পতিতপাবন সতীশকে দেখিয়াই চিনিতে পারিল। বলিল, সতীশদা, তোমার

চেহারা তো এখনো বেশ আছে! আমারও ধরো এই বাষট্টি হোল, আমি তোমার চেয়ে বুড়ো হয়ে গেছি–মানে অম্বলের অসুখে আমার–এতদিন ছিলে কোথায়?

নানা পুরাতন দিনের গল্প হইল। পতিতপাবনের অবস্থা ভাল নয়, ব্যবসায় বার বার ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া সর্বস্বান্ত হইতে বসিয়াছিল। তারপর উপরি উপরি দু'টি উপযুক্ত ছেলে মারা গিয়াছে। ছোট ছেলেটি রেশমের কাপড়ের ব্যবসা করে বিশ্বনাথের গলির মধ্যে–তাতেই কোনোরকমে চলে। ভাইগুলির মধ্যে কেবল ছোট ভাইটি বাঁচিয়া আছে, পাটনাতে শ্বশুরবাড়ি বাসা বাঁধিয়াছিল, বহুদিন হইল সেইখানেই আছে।

সন্ধ্যাবেলা সতীশ দশাশ্বমেধ ঘাটে চুপ করিয়া বসিল। সম্মুখের হাসি-মাখা, কত অজানা তরুণ মুখ–গান...আনন্দের উচ্ছ্বাস...দিব্যেন্দুর কথা মনে পড়িল। দিব্যেন্দু বলিয়াছিল–দাদা, আমি চাকরি করলে তোমার ভাবনা থাক্‌বে না। দিব্যেন্দু জানে না যে, তাহার দাদা লুকাইয়া কাশী চলিয়া আসিয়াছে। এই দশাশ্বমেধ ঘাটে, এই সন্ধ্যাবেলা যেন প্রত্যেক বালককেই মনে হইতে লাগিল দিব্যেন্দু। দিব্যেন্দু না সে পঞ্চান্ন বছর আগেকার নিজে?

আন্নাকালীর মুখ মনে পড়িল–যখন গরুর গাড়ির পাশে দাঁড়াইয়া ঘরের চাবিটা তার হাতে দিয়াছিল, সে সময়কার তার ছলছল চোখ দু'টি মনে পড়িল।

BANGLADARSHAN.COM

নাঃ, সে ডানপিটে সে আর নাই। কাশীও তার কাছে আর কিছুই না। তার সে কাশী হারাইয়া গিয়াছে।

রাত্রে ঘুম হইল না কত রাত পর্যন্ত। শুইয়া শুইয়া ঠিক করিল সে ফিরিয়া যাইবে। আন্নাকালীর জন্য কাশীর কৌটা লইতে হইবে, ছেলেমানুষ, খুশি হইবে এখন। দিব্যেন্দুর জামার উপযুক্ত খানিকটা সিল্ক, পতিতপাবনের কাছে ধারে লইয়া গেলেই হইবে, গিয়া দাম পাঠাইবে। ভাল পট....বৌমা ছবি ভালবাসে।

কিন্তু সকালে উঠিয়াই সে পতিতপাবনকে বলিল–তুমি একটা উপকার করো ভাই আমার। তোমার এখানে আর ক'দিন থাকবো? তুমি একটা বাজার-সরকারী গোছের কাজ জুটিয়ে দাও দিকি আমায়। অভাবে রাঁধুনীগিরিতেও রাজী আছি। খুব ভাল রাঁধতে পারি, দেখে নেবে তারা।

নাঃ, সে ছেলেকে বিব্রত করিতে ফিরিবে না। ছেলে পারিয়া উঠিবে কেন? শেষে কি দিব্যেন্দুর কলেজের পড়া বন্ধ হইবে? বৌমার গহনা বন্ধক দিতে হইবে ছিঃ–

একটা পেটের জন্য কাশীতে আবার ভাবনা?

॥সমাপ্ত॥